বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি কী?

● আকমল হোসেন

কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ককে এক করে দেখার সুযোগ নেই, যদিও দুটিকে সাধারণত এক করে দেখা হয়। একটি দেশের বৈদেশিক সম্পর্ককে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি ও ঘোষণার সমষ্টি হচ্ছে সেদেশের পররাষ্ট্রনীতি। কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্ক হচ্ছে বহির্বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম। বাংলাদেশ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদে দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা সম্পর্কে কিছু নীতির উল্লেখ আছে। তাত্ত্বিকভাবে এসবের ওপর ভিত্তি করে বৈদেশিক সম্পর্ক রচিত হওয়ার কথা। বলা হয়, 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়'– এ নীতিই হচ্ছে দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ভিত্তি। এ নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তির পথ অনুসরণ করবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রই তার শত্রু হিসেবে বিবেচ্য হবে না। আদতে কোনো রাষ্ট্রই শত্রুতা, বিদ্বেষ বা সহিংসতার নীতি অনুসরণের কথা বলে না। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী বা আগ্রাসন পরিচালনাকারী রাষ্ট্রও শান্তির পথ থেকে নিজেকে বিচ্যুত বলে না। সুতরাং পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে এ উচ্চারণ বাংলাদেশের জন্য কোনো আলাদা ভাবমূর্তি তৈরি করে না। স্বাধীনতার পর পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে যেসব নীতি স্থির করা হয়েছিল, সেগুলো প্রায় অপরিবর্তিত আছে তবে বৈদেশিক সম্পর্ক সব সময় পরিবর্তন হয়েছে।

দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে বৈদেশিক সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে যার যার রাজনৈতিক বিবেচনা দিয়ে পরিচালিত হয় বলে তাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার এক হয় না। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য দক্ষিণ এশিয়া ভৌগোলিক কারণে প্রাথমিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রধান রাষ্ট্র ভারতের বেলায় এ দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গি এক হয় না। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতি বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগের নীতি ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। আবার কোনো নির্দিষ্ট সময়ের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও একটা দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করে থাকে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে যার যার ক্ষমতার মেয়াদে বহির্জগতের পরিস্থিতি বিবেচনা করেও বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে।

গত ৫ জানুয়ারির প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের দ্বারা প্রথমবারের মতো কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সংসদীয় ব্যবস্থায় দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এ নির্বাচনের আগে থেকে আন্তর্জাতিক মহলে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক ধরনের চাপ ছিল। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার নামে আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায় ভারত ছাড়া আর কোনো বিদেশি রাষ্ট্র নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে দেখা গেছে। নির্বাচনের প্রশ্নবিদ্ধ চরিত্র বৈদেশিক সম্পর্কে কোনো গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি বটে, তবে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিত্রদের কাছে সরকারের ভাবমূর্তি নিয়ে সঙ্কট লক্ষ্য করা যায়। ব্যতিক্রম হিসেবে প্রতিবেশী ভারত আওয়ামী লীগের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার যুক্তিকে গ্রহণ করেছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসক কংগ্রেস দলের বিশেষ সম্পর্কের আলোকে।

৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দারুণ অনিশ্চয়তা থাকায় আওয়ামী লীগসহ তার জোটমিত্রদের নির্বাচনী ইশতেহার অনেকটা দায়সারাভাবে ঘোষণা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা ইস্যু স্থান পেলেও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ে কোনো লক্ষ্য স্থির করা হয়নি। সেদিক থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বৈদেশিক সম্পর্কে কোন দেশ ও বিষয়কে অগ্রাধিকার

স্বাধীনতার পর পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে যেসব নীতি স্থির করা হয়েছিল, সেগুলো প্রায় অপরিবর্তিত আছে তবে বৈদেশিক সম্পর্ক সব সময় পরিবর্তন হয়েছে।

...

নতুনভাবে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনা জাপান ও চীন সফর করে এসেছেন। নির্বাচনের আগে এ দেশ দুটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতো অবস্থান গ্রহণ করেনি। তারা নিজস্ব বিবেচনা থেকে চালিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের জন্য তা আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা সুযোগ হিসেবে এসেছে নিশ্চয়। এ দেশ দুটো ভ্রমণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পূর্বমুখী কূটনীতি, যা বিএনপির আগের মেয়াদে শুরু হয়েছিল, তাকে জোরদার করতে চেষ্টা করছেন

দেবে তা পরিষ্কার নয়। অথচ নবম সংসদ নির্বাচনের আগে দলটির পক্ষ থেকে প্রচারিত ইশতেহারে পররাষ্ট্রনীতি তথা বৈদেশিক সম্পর্ককে নিয়ে অনেক লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। এর পেছনের অন্যতম কারণ হতে পারে নির্বাচন নিয়ে তখন কোনো সংশয় যেমন ছিল না আবার নির্বাচন নিয়ে স্বাভাবিক প্রচার-প্রচারণাও ছিল।

২০০৮ সালের নির্বাচন ইশতেহারে পররাষ্ট্র সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটানোর কথা বলা হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের (লক্ষণীয়ভাবে পাকিস্তান অনুপস্থিত ছিল) সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করা থেকে পাশ্চাত্যের মিত্ররাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডা, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তারের অঙ্গীকার ছিল। পাশাপাশি 'মুসলিম উম্মাহ'র সঙ্গে সংহতি বৃদ্ধিসহ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার কথাও ইশতেহারে ছিল। অভ্যন্তরীণ নানা লক্ষ্যের সঙ্গে বৈদেশিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির করার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে ক্ষমতায় থাকাকালে দলটির করণীয় সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে। কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সম্পর্ক গুরুত্ব পায়নি। বলা দরকার, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে পররাষ্ট্র ইস্যুকে ভোট আকর্ষণ করার জন্য তুলে ধরার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয় না কখনই।

২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের প্রথম মেয়াদে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক দুটি ইস্যুতে তখন বাংলাদেশ প্রতিবেশীর স্বার্থরক্ষা করতে পেরেছে। বাংলাদেশের মাটি ভারতের জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগটি অনেক দিনের পুরনো। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বলে বলীয়ান আওয়ামী লীগ শুরুতেই অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে উলফা বিদ্রোহী নেতাদের ভারতের হাতে তুলে দিয়ে ভারতকে তার নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত করেছিল। বাংলাদেশের এ পদক্ষেপ ভারত সরকারকে প্রীত করেছিল নিঃসন্দেহে। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের বহু আকাঙ্ক্ষিত ট্রানজিট পাওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগ সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল। 'কানেকটিভিটি' ধারণার বাস্তবায়ন হয়েছিল ত্রিপুরায় নির্মাণাধীন পালাটানা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভারী ভারী সরঞ্জাম নৌপথে বহন করে স্থলপথে প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে। এজন্য ভারতকে কোনো ভাড়া পরিশোধ করতে হয়নি, আবার তিতাস নদীর ওপর মাটির বাঁধ দিয়ে সাময়িকভাবে প্রবাহ বন্ধ করে যাতায়াতের পথ তৈরি করা হয়েছিল। বলা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার বিনিময়ে ভারতের দিক থেকে মোটা রকম কোনো লাভের মুখ না দেখেও ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। লক্ষণীয় যে, এ মেয়াদে আওয়ামী লীগের কাছে ভারত যতদূর গুরুত্ব পেয়েছে সে তুলনায় অন্য আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো পায়নি।

কিন্তু একই সময় যুক্তরাষ্ট্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, যা এ মেয়াদেও বহন করতে হচ্ছে। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে কেন্দ্র করে দুদেশের সম্পর্কে জটিলতার সূত্রপাত হতে দেখা গেছে। যার জেরে পদ্মা সেতুর জন্য বিশ্বব্যাংকের অঙ্গীকারকৃত ঋণের টাকা বাতিল হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব নিয়ে কোনো সন্দেহ না থাকায় ঋণ নিয়ে এ ধরনের যুক্তি দেয়া যায়। দুর্নীতির অপ্রমাণিত অভিযোগে ঋণ বাতিল হওয়ার কথা বলা হলেও প্রফেসর ইউনূসই যে প্রধান কারণ তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অন্যদিকে তাজরীন-রানা প্লাজা মর্মান্তিক ঘটনায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নিয়ে সমালোচনার প্রেক্ষাপটে জিএসপি সুবিধা স্থগিত হওয়ার পেছনে সম্পর্কের জটিলতাও দায়ী। ১৬ দফা শর্ত পূরণের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সৃষ্ট জটিলতার রাজনৈতিক কারণ ঋণ ও জিএসপিকে প্রভাবিত করেছে বলা কোনো অতিকথন হয় না।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে কংগ্রেস দলের মতাদর্শিক মিল বরাবরই ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দুদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে মিলের পেছনে দল দুটির সমজাতীয় মতাদর্শের ভূমিকা ছিল। তাছাড়া এদের নেতৃত্বের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সমঝোতা ও আস্থার প্রকাশও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫-এর আগস্টে বাংলাদেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন সংঘটিত হলে দুদেশের সরকারের মধ্যে সুসম্পর্কে ছেদ ঘটে। সামরিক শাসনের ব্যাপারে তখনকার ভারতীয় নেতৃত্বের বিতৃষ্ণা দুদেশের মধ্যে গঙ্গা নদী নিয়ে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ বিরতির পর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে এলে ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত গঙ্গা নদীর পানি ভাগাভাগির জন্য ৩০ বছরের চুক্তি এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল। দুদেশের রাজনৈতিক পর্যায়ে সমঝোতা হওয়ায় এ চুক্তি দুটি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছিল। ২০০৯ সালে আবার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের স্বার্থে যে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে তা আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেস দলের বিশেষ সম্পর্ককে তুলে ধরে।

তবে গত জুনে দিল্লিতে বিজেপির ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগকে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল, যদিও তা বিএনপিকে আশ্বস্ত করেছিল। ভিন্ন কারণে দল দুটি ভারতের ব্যাপারে নিজস্ব অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মিত্র কংগ্রেসের বদলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির ক্ষমতায় আরোহণকে আওয়ামী লীগ তার স্বার্থবিরোধী মনে করেছিল। অন্যদিকে বিএনপি মনে করেছিল, ভারতের নতুন সরকার আওয়ামী লীগের প্রতি আগের সরকারের মতো সমর্থন দেবে না। ভারতীয় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তারা নরেন্দ্র মোদিকে যেভাবে প্রতিযোগিতা করে অভিনন্দন জানাতে শুরু করেছিল তা থেকে বিজেপির কাছ থেকে সুনজর পাওয়ার একটা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার তার দক্ষিণ এশীয় পররাষ্ট্রনীতিতে চমক দেখিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে ঢাকা সফরে পাঠিয়ে বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছে। তাতে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে কিনা তা বাংলাদেশের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়ে ভারত কত দ্রুত সাড়া দেয় তার ওপর নির্ভর করবে।

কিন্তু ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তৈরি জটিলতা কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং আগামীতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকার ও বিরোধী দলের আলোচনার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুরুত্বারোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে 'গার্ল সামিটে' যোগদানের উদ্দেশ্যে লন্ডন সফররত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের কাছে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার সুযোগ নিয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। তবে তা নির্বাচনকেন্দ্রিক জটিলতা কতদূর কমাতে পারে তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে। নতুনভাবে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনা জাপান ও চীন সফর করে এসেছেন। নির্বাচনের আগে এ দেশ দুটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতো অবস্থান গ্রহণ করেনি। তারা নিজস্ব বিবেচনা থেকে চালিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের জন্য তা আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা সুযোগ হিসেবে এসেছে নিশ্চয়। এ দেশ দুটো ভ্রমণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পূর্বমুখী কূটনীতি, যা বিএনপির আগের মেয়াদে শুরু হয়েছিল, তাকে জোরদার করতে চেষ্টা করছেন। ■